দীপান্তর

সীমান্ত গুহঠাকুরতা

সমসেরনগরে বাঘ ঢুকেছে। এই স্বরূপকাঠি থেকে সমসেরনগর বিস্তর পথ। পথে পড়ে রায়মঙ্গল। গোয়ালঘরের হাড়-পাঁজরা বের করা বলদ দুটোর দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল কৃষ্ণপদ। বাঘের নাম শুনেছ কৃষ্ণ, দেখেনি কোনোদিন।

টিপির -টিপির বর্ষা শুরু হলো আবার। নিতাই মাস্টার সাত সকালে হাঁক দিয়ে গেছে। টানা তিনদিন হুড়ুম - ধাড়ুম বর্ষা গেছে। আজ ভোরের দিকে একটু ধরতেই হাল - বলদ নিয়ে মাঠের নামার ধুম পড়ে গেছে। এখানে সব এক-ফসলি জমি। এই বর্ষাতেই যা চাষবাস। নিতাই মাস্টারের পঁচিশ বিঘা জমি। আর ভেড়িও আছে খান তিনেক— বড় বড়।

বাঘটা নাকি বিশাল বড়। এমনিতে সমসেনগরে বছরে দু'একবার বাঘ ঢোকেই। একবারে জঙ্গল লাগোয় গাঁ। বনপাঠি জাল লাগিয়ে দিয়ে গেছে। তো বড়মিঞার কাছে ও জাল আর কী! জোরসে এক থাবা মারলেই ফাঁক। কৃষ্ণপদ উঠি-উঠি করেও দাওয়ায় ঝুপসি অন্ধকার কোণটায় বসে থাকে। আকাশের রঙ বিচ্ছিরি ফ্যাকাশে। কুয়োতলার ওপর দিয়ে ধীরে - সুস্থে পুকুরের দিকে চলে গেল লম্বা একটা দাঁড়াশ সাপ।

কৃষ্ণপদর হাতে পায়ে বাঘের তাগত, তবু কৃষ্ণপদ বাঘ নয়। কৃষ্ণপদর গোয়ালে দুটো হেলে বলদ। কৃষ্ণপদর ঘর ফাঁকা। বাপ মরেছে গত বর্ষায়, ওই নিতাই মাস্টারের জমিতেই। আল - কেউটের এক ছোবলেই ফৌত। মা-টা টিকে আছে এখনো। সাতকেলে বুইন। খুনখুনে গলায় কালি বলে, 'অ কৃষ্ণ, এবার একটা বউ আন বাপ্।'

কৃষ্ণপদর কোনো পোষা বাঘও নেই। ময়না এখন বাঘের পিঠে সওয়ার। দাওয়ার খুঁটিতে হেলানো জং ধরা সাইকেলটার দিকে চেয়ে রইল কৃষ্ণপদ, অনেকক্ষণ। জমি নেই, পরিতোষেহ মত পয়সাঅলা বাপ নেই কৃষ্ণর। তাকে মেয়ে দেবার জন্য কোনো বাপ হেদিয়ে বসে নেই!

'কৃষ্ণ আছিস নাকি?' বেড়ায় ওপরে পীচ - রাস্তা থেকে হাঁক পাড়ল যোগেন। যোগেন মন্ডল নিতাই মাস্টারের মুনসি। নিতাই মাস্টার ছাত্র দাবড়ায় স্কুলে, আর যোগেন তার জমিজমা সামলায়, মজুর দাবড়ায়

'শালার দালাল' কৃষ্ণ হিসহিস করে। তারপর গলা তুলে বলে, 'আছি। ক্যানো?'

'নিতাইদা ডাকে। বলদ নে আয়। বেলা তো কম গেল না।'

'যাব এখন। তুমি আগাও।'

'জলদি আয় বাপ্!' যোগেন সাইকেলে উঠে জোরসে প্যাডেল করে।

'ধুত্তোর তোর চাষের ইয়ে মারি।' কৃষ্ণ উঠে পড়ে। দাওয়ায় টাঙানো দড়ি থেকে প্যান্টটা নামিয়ে পরে নেয়। শার্টট্যা গলায়। হাঁক পেড়ে বলে, 'মা, আমি একটু যোগেশগঞ্জ যাচ্ছি। পান্তাটা রইল, দুপুরে খেইয়ে নিও এখন। ফিরতি রাত হতি পারে।'

'ক্যানোরে, নিতাই মাস্টার যে ডাকল তোরে, যাবি না?' ঘরের ভেতর থেকে বুড়ির খুনখুনে আওয়াজ ভেসে আসে, 'এই সাতসকালে যোগেশগঞ্জে তোর কাগ কী?'

কৃষ্ণপদ জবাব দেয় না। সাইকেল ঠেলে উঠোনোর কাদা টপকে পীচ রাস্তায় ওঠে।

আজ কৃষ্ণপদ বাঘ দেখতে যাবে।

কৃষ্ণপদ কোনোদিন বাঘ দেখেনি। বাঘ থাকে যে ঠাঁয়ে, সেই সোঁদরবন দেখেছে বেশ কয়েকবার। এই তো গেল বছর, বড় ভুটভুটি ভাড়া করে গোসাবার পার্টির মিটিং-এ গেছিল গাঁ-সুদ্ধু লোক। কৃষ্ণপদও ভিড়ে গেছিল। পাক্কা পাঁচ ঘন্টার পথ গোসাবা। তার মধ্যে ঘন্টা দেড়েক ভুটভুটি চলে একেবারে জঙ্গল ঘেঁষে ঘেঁসে। তা সে গোটা পথটাই ভুটভুটির ছাতে বসে একটানা জঙ্গলের দিকে চেয়েছিল কৃষ্ণ। তাকিয়ে থাকতে থাকতে এমন যেন ঘোর লেগে যায়।

হোগলা, কেঁওড়া, সুন্দরী, হেতালের সেই উতল সবুজ জঙ্গল দেখে কেমন গা ছমছম করে কৃষ্ণর। কী গহন গভীর সেই অরণ্য। সে যেন এক অন্য দেশ, অন্য রাজত্ব। বড়মিঞা তার রাজা। আকাশে খুব কালো মেঘ করেছিল সেদিন। সেই মেঘের ছায়ামাখা জঙ্গল মেন যেন এক ভুতুড়ে নেশার মত পেয়ে বসেছিল কৃষ্ণকে।

ফিরতে সাঁঝ উতরে গেছিল সেদিন। রাতের অরণ্যের দিকেও একইরকম নেশাধরার চোখে তাকিয়ে বসেছিল কৃষ্ণপদ। সেই জঙ্গলদেশের ভিতরে রাতেই তো যত কাজকারবার। বাইরে থেকে তার আভাসটুকুও বুঝিবা মেলে না। রাতের সেই জঙ্গল শুধু জেগে থাকে কালো চাদর মোড়া একটা পৃথিবীর মত। ভাবতে গা-শিরশির করে কৃষ্ণর।

সেই থেকে রাতের জঙ্গলটা জেগে থাকে কৃষ্ণের ভিতরে। মাঝে মাঝে একটা শিরশিরানিতে তার অস্তিত্ব টের পায় কৃষ্ণ। কেমন একটা ভয় - ভয় করে তার তখন।

দুই

লেবুখালির ফেরিঘাট যেতে পীচ-রাস্তা ছেড়ে বাঁধ - রাস্তা ধরল কৃষ্ণ। শর্টকার্ট হবে। ইছামতিতে এখন ভরা জোয়ার। এই বর্ষায় ইছামতির শরীর - ভরা যৌবন। ময়নার মতই। তাঁদের গাঁ স্বরূপকাঠি পার করেই ইছামতি দু'ভাগ হয়ে গেছে। একভাগ কালিন্দি হয়ে ঢুকেছে ওই দেশে। আর একভাগ — রামমঙ্গল — চলে গেছে আবাদ ছাড়িয়ে সেই বাদাবনের দিকে। যেখানে বাঘ থাকে। ওই রায়মঙ্গল পেরিয়েই ট্রেকার ধরবে কৃষ্ণপদ। বাঁধের মাটির রাস্তায় বর্ষায় প্যাঁচপেঁচে। তবু জোরসে প্যাডেল করে কৃষ্ণ।

ওই হোতা, ইছামতি ওপারে যে মাটি দেখা যায়, সেটা এ দেশ নয়। সেটা অন্য ভূমি, অন্য রাষ্ট্র। রাতের বেলা কখনো - সখনো নদীপাড়ে এলে ইছামতির ওই ওপারের দিকে চেয়ে থাকে কৃষ্ণপদ। জ্যোৎস্না পড়ে ওপারের ওই সবুজ সীমারেখাটাকে অবিকল সেই গভীর কালো অরণ্যের মতই দেখায় তখন।

ইছামতি পার হওয়ার পায় না। কিন্তু এপার - ওপার কোথাওই তো কোনো জাল ঘেরা নেই। তার এপারে বি. এস. এফ. আর ওপারে বি.ডি.আর -এর নজর এড়িয়ে হরদম লোক ঢোকে এদেশে। ওরা অবশ্য বাঘ নয়। রোগা - সোগা, ভীতু - ভীতু চেহারার মানুষজন সব। দু'চারদিন এর তার বাইড় গা-ঢাকা দিয়ে থাকে, তারপর আবার কোনো রাতের অন্ধকারে পাড়ি দেয় শহর কলকাতার দিকে।

কেন ওরা আসে, কোথাই বা যায় — কৃষ্ণপদ জানে না। শুধু জানে, ইছামতির ওই ওপারটা তাদের দেশ নয়। সে দেশের রীতি - কানুন আলাদা। দিন-রাতে সে দেশের অন্য রাজার রাজত্ব চলে।

ঘোড়ার মুখের খবরটা পাওয়া গেল হেমনগরের পরেশ সামন্তর কাছে। সামন্ত খুব জোগাড়ি লোক। এই জলাবাদার দেশে সারাদিন সাতঘাটে চক্কর মেরে বেড়ানোই ওর কাজ। কন্ট্রকটারির ব্যবসা করে প্রচুর পয়সা মেরেছে লোকটা। ইদানীং প্রধানমন্ত্রী গ্রাম - সড়ক যোজনায় ভিতর - ভিতর প্রচুর পীচ রাস্তা তৈরি হচ্ছে। তারই ধান্দায় পরেশ সামন্ত এই পঞ্চায়েত, ওই বি.ডি.ও অফিস করে বেড়ায় চৌপরদিন।

বোটের আড়ায় বিড়ি মুখে বাঘের গপ্পো ফেঁদে বসেছিল সামন্ত। এক নৌকা লোক হাঁ করে গিলছিল।

'বনপার্টি ছাগলের টোপ ফেলেছিল। ভোরবেলায় ধরা পইড়েছেন মিঞা।' সামন্ত বলছিল, 'আমারে খবর দিল সুবল, আমার ভাইপো। সকালে ওরে কালীতলা পাঠায়েছিলাম, সেখান থেকেই শুইনে এলো। তা ভাবলাম, এইবেলা দেইখে আসিগে। এমন সুযোগ ছাড়তি আছে?'

দেখা গেল নৌকোয় কম করে জনা দশেক লোক চলেছে ওই দিকেই। বাদা অঞ্চলের বাদাসে আজ একটা সবচেয়ে বড় খবর।

বাঘটা নাকি তিনদিন ধরে জোর নাচিয়েছে সামসেরনগরের মানুষজনকে। তিনটে গরু আর পাঁচটা ছাগল মেরেছে। মানুষ মারেনি একটাও। মারবেটা কীভাবে? তিনদিন ধরে সামসেরনগরের মানুষজন রাতের বেলা ঘর থেকে বেরুনোই বন্ধ করে দিয়েছিলো।

হঠাৎই বুকটা ধড়াস করে ওঠে কৃষ্ণপদর। বোটের একেবারে সামনের দিকে দাঁড়িয়ে পরিতোষ। কালো জিন্সের প্যান্ট, গায়ের সঙ্গে লেপ্টে থাকা আঁটোসাঁটো হলুদ - কালো টি-শার্ট, চোখে সানগ্লাস—অবিকল একটা বাঘের মতই লাগে ওকে। কৃষ্ণপদ একটু গুটিয়ে বসে, সামনে বসা লোকটার পিঠে আড়াল খোঁজে।

'কেউ জানতে পারলে তোর লাশ ওই ভেড়ির জলে ইট বেঁধে চুবিয়ে দেবে।' কৃষ্ণপদর বুকের ওপর স্যান্ডো গেঞ্জিটা কলারের মত খামচে ধরে বলেছিল পরিতোষ।

একটা কোদাল চেয়ে আনতে জমি থেকে ভরদুপুরে নিতাই মাস্টারের বাড়ি এসেছিল কৃষ্ণপদ। ভিতর ঘর থেকে ফিস্‌ফাস্ আওয়াজ শুনে চোর - টোর ঢুকেছে কিনা দেখতে জানলা দিয়ে উঁকি মেরেছিল।

পরিতোষ তখন ময়নার শরীরটাকে বিছানায় ফেলে ধমসাচ্ছিল। ময়নার উদোম বুকে জোরাতার মুখ ঘষছিল আর শ্বাস ফেলছিল ঘনঘন। ওই শ্বাসের শব্দই বুঝি শুনেছিল কৃষ্ণ।

ময়নাকে পরিতোষের নতুন মোটরবাইকে চড়ে ঘুরতে দেখেছে কৃষ্ণ। হিঙ্গলগঞ্জ বাজারে অনিল মন্ডলের নতুন দোকানে দাঁড়িয়ে চাউমিন খেতে দেখেছে একসাথে। দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। ময়নার বাপ ষষ্ঠীপদ জোতদার পঞ্চায়েত মেম্বার, পার্টির মাতব্বর।

তবেব ময়নাকে ভরদুপুরে নিজে ঘরে এনে ঢোকাবে পরিতোষ— এতটা ভাবতে পারেনি কৃষ্ণ। হঠাৎ পায়ের দিকের আয়নায় তাকে দেখতে পায় ময়না, আর 'ও মাগো' বলে চেঁচিয়ে ওঠে। পরিতোষও লাফ দিয়ে উঠেছিল।

তারপর প্যান্টের বোতাম আঁটতে আঁটতে বাইরে এসে সোজা কৃষ্ণপদর টুটি টিপে ধরে বলেছিল, 'বাইনচোত্, ভরদুপুরে লোকের জানলায় উঁকি মারিস কেন রে?'

'তুমিই বা ভরদুপরে ঘরে মেয়ে ঢোকাও কোন্ সাহসে?' —এমন কিছু বলা উচিত ছিল কৃষ্ণর। বলেনি। মুখ বুঁজে পরিতোষের চড় -থাপ্পড়গুলো হজম করেছিল। করেছিল, কারণ কৃষ্ণপদ বাঘ নয়। সে নেহাৎই পরিতোষের বাপের জমিতে রোজের হিসেবে খাটতে আসা মজুর।

তিন

কুঁড়েখালির খালপাড় ধরে একেবারে হরিহরছত্রের মেলা বসে গেছে। আশপাশের চার - পাঁচটা দ্বীপ ঝেঁটিয়ে মানুষজন এসেছে। তার মধ্যেই ক্যামেরা গলায় দু-চারটে শহুরে চেহারাও চোখে পড়ল কৃষ্ণপদর। রিপোর্টার গন্ধে গন্ধে এসে জুটেছে। কৃষ্ণপদ খালধারে যাবার জন্য ভিড়ের ভিতর ফাঁক খোঁজে।

খালের মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে অল্প অল্প দুলছে লঞ্চটা। তার ওপর পিছনবাগে রাখা লোহার খাঁচাটা। খালের জল শান্ত, তবু লঞ্চটা রীতিমত দুলছে। দুলছে খাঁচার ভিতর রাখা জন্তুটার দাপাদাপির চোটে। খাঁচার ওপর ত্রিপল পেতে বন্দুক হাতে বসে আছে খাকি হাফ প্যান্ট পরা একটা লোক। ওই বুঝি রতন তাঁতি, বাঘ মারার ওস্তাদ। কৃষ্ণর কেমন একটা ঘোর লেগে যায় জানোয়ারটাকে দেখতে দেখতে। ওর কাছে ওর ঘাড়ের ওপর চেপে বসা ওই মানুষটা তো নস্যি। যত জোর তো ওই বন্দুকটার। কোথাও জোর বন্দুকের, কোথাও টাকার— কৃষ্ণপদ ভাবে।

বাপরে! বড়মিঞা বুঝি এরেই কয়। সারাটা শরীর থেকে তেজ যেন ফেটে বেরুচ্ছে। ওই ছোট্ট খাঁচাটির ভেতর কেমন যেন বেখাপ্পা লাগে ওকে কৃষ্ণর। কেমন যেন একটা কষ্ট হয় বুকের ভিতর।

খাঁচার এককোণে পড়ে একটা মরা ছাগল। খায়নি, শুধু দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ফালাফালা করেছে সেটাকে বাঘটা। নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে কেমন একটা ঘিনঘিনে চেহারা হয়েছে ওটার। যত আক্রোশ যেন মিটিয়েছে বাঘটা ওটার ওপর।

হঠাৎ খালপারসুদ্ধ লোকের একেবারে হাড়ের ভিতর পর্যন্ত কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়ে একটা গর্জন ছাড়ে বাঘটা। কিন্তু কৃষ্ণ চমকায়না একটুও। কেন, তা সে নিজেও জানে না।

'বাপরে, তেজ দেখি কম না'। পাশে দাঁড়ানো ফেজটুপি আর লুঙ্গিপরা লোকটা বেশ মস্করার সুরেই কথাটা বলে। তারপর প্রায় ফিসফিস করে যোগ করে, 'খাঁচাখান পোক্ত তো? শালাগো বিশ্বাস নাই।'

'ভাইডি আছছো কন্ থে?' লোকটা কৃষ্ণর সঙ্গে খেঁজুরে আলাপের চেষ্টা করে। কৃষ্ণ জবাব দেয় না। সে কেমন ধ্যানের মধ্যে ডুবে আছে। নজর পলকহীন— ওই খাঁচার দিকে।

কৃষ্ণ বোঝে না কেন তার শিরায় শিরায় রক্ত এমন উদ্দাম ছোটাছুটি লাগিয়েছে। কী একটা যেন বদলে যাচ্ছে তার বুকের ভিতর। গত বছর পুজোয়, বিসর্জনের রাতে সাহেবখালির মন্টু বাংলা খাইয়েছিল তাকে। জীবনে ওই একবারই। সেবার, সেই অমাবস্যার মাঝরাতেও শরীর জুড়ে এই ঝড়টা টের পেয়েছিল কৃষ্ণপদ। নিজেকে কেমন অন্য এক মানুষ মনে হচ্ছিল তখন। কে যে ঘুমিয়ে থাকে ভিতরে, কখন যে জাগে, কেন যে জাগে— কৃষ্ণ ভেবে থই পায় না।

'এটা মানুষখেকো বাঘ না। জঙ্গলের ভিতর অন্য বাঘের কাছে এলাকা দখলের লড়াইতে হেরে গিয়ে গ্রামের দিকে চলে এসেছে।'

বনপার্টির কোনো অফিসার হবে লোকটা। ঘিরে ধরা রিপোর্টারগুলোকে খুব হাত - পা নেড়ে বোঝাচ্ছে। লোকটাকে ঘিরে জটলাটা বড় হচ্ছে। সবাই বাঘ ধরার গপ্পো শুনতে চায়।

'গরু-ছাগলগুলোকে রাগেই মেরেছে, ক্ষিধেয় নয়। একটা বাঘের এত খোরাক লাগে না। লোকটা বলে চলে, 'আমরা এটাকে মাইল দশের দূরের অন্য দ্বীপের জঙ্গলে ছেড়ে দেব। ওই জঙ্গলের আশেপাশে লোকালয় নেই।'

'সে জঙ্গলে বুঝি অন্য বাঘ নাই?' কৃষ্ণর খুব জানতে ইচ্ছে করছিল কথাটা, ওই অফিসারকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছিল।

আধঘন্টা পর লঞ্চটা ছাড়ল। শেষবেলায়, ওপারের ওই ঘন হেতালবনের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে আবার একটা হুঙ্কার ছাড়ল বাঘটা। কৃষ্ণর শিরায় শিরায় যেন ঢেউ তুলে ছড়িয়ে পড়ল সেই আওয়াজ। তারপরই মৃদু গরগর শব্দ তুলে ছেড়ে দিয়ে লঞ্চটা।

কুঁড়েখালির জঙ্গল ছাড়িয়ে রায়মঙ্গলের উজানে যাবে ওই লঞ্চ। এ্যাদ্দিন ওই জঙ্গলেরই রাজা ছিল বাঘটা। ইচ্ছেমত হরিণ, শুয়োর মেরে খেত। মানুষ সমান উঁচু ঘাসবনের ভিতর বাঘিনীর টুঁটি টিপে তাকে সোহাগ দিতে বাধ্য করত। যতদূর চোখ যায় কৃষ্ণ চেয়ে থাকে লঞ্চটার দিকে, তার ওপর রাখা ওই লোহার খাঁচাটার দিকে। শরীর জুড়ে সেই অচেনা কিন্তু পরিচিত শিরশিরানিটা টের পায় কৃষ্ণ। চারপাশের হাট - ভাঙা ভিড়, ধাক্কাধাক্কি আর চেঁচামেচি ছাপিয়ে ওর চোখে ভেসে ওঠে রাতের জঙ্গলের সেই হারিয়ে যাওয়া ছবিটা।

চার

লেবুখালি ফিরতেই সাঁঝ উতরে গেল। চারধারে তখন ঘরমুখো মানুষের স্রোত। চাক্ষুস বাঘ দেখার টাটকা ঢেঁকুরটা বাড়ি ফিরে উগড়ে দেবার তাড়ায় সবাই তেঁড়েফুঁড়ে ছুটছে।

পরপর পাঁচটা ট্রেকারে জায়গা মিলল না। ছ'নম্বরটায় কোনোমতে নিজেকে ঠেসে দিল কৃষ্ণ। আর উপায় ছিল না। লাস্ট বোট ছেড়ে গেলে ওই লেবুখালির বোটঘাটে বন্ধ চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে শুয়ে রাত কাটাতে হ'ত।

ঘন কালো পীচ রাস্তার ওপর হেডলাইটের হলুদ ডোরা ফেলে ছুটছিল ট্রেকারটা। পেট বোঝাই মানুষ নিয়ে। ড্রাইভারের পাশে জড়োসড়ো হয়ে বসে থেকে, সেই দিকে চেয়েছিল কৃষ্ণ। অত লোড সইতে না পেরে ইঞ্জিনটা গোঁ গোঁ শব্দ তুলছিল। কৃষ্ণর শরীর ভিড়ের চাপে কেমন ভেপসে ওঠে। বুকের বোতাম দুটো খুলে নেয় সে।

ঘাট পেরিয়ে এপারে পৌঁছাতে আটটা বাজল। মেঘ - টেঘ কেটে দিব্যি একটা ফ্যাক্‌ফেকে জ্যোৎস্না বেরিয়েছে এখন। একটা কেমন গুমোট গরমও ছাড়ছে। গায়ের জামাটা খুলে হাতে ঝুলিয়ে নেয় কৃষ্ণ।

সাইকেল গ্যারেজটা বন্ধ হয়ে গেছে। লাস্ট বোড অব্দি তো খোলা থাকার কথা। যাক্‌গে, কাল সকালে এসে নেওয়া যাবেখন। কৃষ্ণ হাঁটা লাগায়।

'কে ও? কৃষ্ণপদ নাকি?' গায়ে একটা পাঁচ সেলের বড় টর্চের আলো এসে বড়ল। গলাটা চেনা। পাশের গাঁ আমবেড়ের অখিল মিস্ত্রী।

'অয়!' কৃষ্ণ ঘাড় ঘুরিয়ে সংক্ষেপে জবাব দেয়। হাঁটা থামায় না।

টর্চ দোলাতে দোলাতে পাশে চলে আসে অখিল। 'কই গিসিলি? নিতাই মাস্টার তোরে সমস্ত দিন খুঁজে নাকাল। কামধাম করতি হবে না? খোরাকিটা কি গাবায়ে আসবে?'

জ্যোৎস্নার আবছা অলোয় অখিলের কুতকুতে চোখ দুটোর দিকে তাকায় কৃষ্ণ। এ শালা শেয়ালের জাত। পার্টির নেতাগুলো যেটুকু ফেলে -ছড়িয়ে যায়, তাই হামলে পড়ে খায়।

কৃষ্ণর চোখে কী দেখে অখিল কে জানে! হঠাৎ থমকে যায়। প্রসঙ্গ পাল্টে বলে, 'অলপথে যা। তাড়াতাড়ি হবেখন। তোর মায়ে চিন্তা করে।'

কৃষ্ণ জবাব দেয় না। পীচ রাস্তা ছেড়ে আলপথে নেমে যায়। দু-পাশের দেড় মানুষ উঁচু পাটক্ষেতের মাঝখান ধরে হাঁটা লাগায়। ফ্যাকাশে জ্যোৎস্নায় পাটক্ষেতটাকে অবিকল সেই জঙ্গলের মতই লাগে তার।

পাটক্ষেতের সীমানা বরাবর ইট বাঁধানো রাস্তায় উঠে পড়ল কৃষ্ণপদ। সামনের দিক থেকে একটা মেয়েছেলে হেঁটে আসছে। মাটির দিকে চোখ, সামান্য দুলকি চালে হাঁটা। ময়না। ওই চেহারা কৃষ্ণর অন্ধকারেও চিনতে ভুল হবে না। তার কানের খুব কাছে আবার বাঘটা ডেকে ওঠে। এত রাতে কোথায় অভিসার সেরে ফিরছে ময়না? ওই দিকেই তো পরিতোষের বাড়ি।

সট্ করে একটা কদমগাছের আড়ালে চলে যায় কৃষ্ণ। সামান্য ঝুঁকে, যেন ওত পেতে অপেক্ষা করতে থাকে।

ময়না তাকে দেখেনি। মুখ নীচু করেই হেঁটে আসছিল। কদমগাছটা পার হতেই ঝাঁপাল কৃষ্ণপদ। ডানহাতে আগেই চেপে ধরল ময়নার মুখটা, আর বাঁ-হাতে ওর কোমরটা বেড় দিয়ে ধরে এক ঝটকায় ঢুকিয়ে নিল উল্টোদিকে, পাটক্ষেতের ভিতর।

আধঘন্টা পর যখন পাটক্ষেত থেকে বেরিয়ে এল কৃষ্ণ, তখন তার সারা গায়ে কাদা, আর ঠোঁটের কোনায় লেগে আছে মুক্তোর দানার মত একবিন্দু রক্ত।

পাঁচ

অলৌকিক এক জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে রাতের ইছামতি। দূরে, নিবিড় কালো এক বনভূমির মত জেগে আছে ওপারের অস্পষ্ট সীমান্তরেখা।

কৃষ্ণপদ জলে নামল।

ওপারে তার জন্য অপেক্ষা করে আছে এক নতুন দেশ, নতুন এক অরণ্যভূমি।